সপ্তম অধ্যায়

দর্শনার্থীর আগমন

একদিন সকালে রান্না করিতে যাইতেছি এমন সময় ভূপেন* আসিয়া জ্যোতিষের নাম করিয়া বলিল — আমি এগ্রিকালচার অফিসে কাজ করি। জ্যোতিষবাবু আপনার সহিত দেখা করিতে অভিলাষী। ভোলানাথ বলিল — আচ্ছা। সব শুনিলাম। সেই সময়ে কেহ দেখা করিতে আসিলে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিতাম, না হয় রান্না ঘরে চলিয়া যাইতাম। ভোলানাথ ডাকিত এবং অনেক সময় বলিত যে সকলে সৎ উপদেশ শুনিতেই ত আসে। তুমি এইরূপ কর কেন ?

দুই এক দিনের ভিতর দেখিলাম যে সকাল বেলা তিনজন আসিল। ভোলানাথ ডাকিলে আসিলাম। সকলের নিকট তখন এ শরীরের ঘোমটাই থাকিত। কুণ্ডলী দিয়া একবার কথা আরম্ভ হইলে তখন আর মাথার কাপড় টানাটানির কোন খেয়ালই থাকিত না। যখন যেমন থাকিত। সেইদিন আসিয়া তাহাদিগকে বসিবার জন্য তিনখানি পিঁড়ি দিলাম। তাহারা বসিল। এই শরীরেরও কুণ্ডলী দিয়া বসাটা তখন হইয়া গেল। কুণ্ডলী দিয়া স্থিরভাবে আসনে বসিয়া আছি, ভোলানাথও সেখানে আছে। জ্যোতিষ জিজ্ঞাসা করিল — আমাদের পারমার্থিক উন্নতির কোন আশা আছে কি ? এ শরীর বলিল — ক্ষুধা তো এখনো পায় নাই। আর বিশেষ কোনও কথাবার্তা হইল না। খানিক বসিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

কুণ্ডলী মুছিয়া উঠিয়া অন্য ঘরে যাইতেছি, তাহারা ঘর হইতে প্রায় শত হাতের বেশী দূরে গিয়াছে জ্যোতিষের উপর এ শরীরের লক্ষ্য পড়িল। পিছন দিকটা দেখা গেল, তাহার গায়ে একটি চাদর মাত্র। অথচ পরে শুনিয়াছি যে সে সময় তাহার জামা ও চাদর উভয় ছিল। এই শরীরের দৃষ্টিতে আসিল যে সূতার নালের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে তাহার সহিত পরমার্থসূত্রে এ শরীরের সংযোগ রহিয়াছে।

* ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত — ঢাকা এগ্রিকালচারাল অফিসের কর্মচারী

শুধু পরমার্থ নিয়াই সকলের এ শরীরের কাছে আসা ত। ইহার পর সে প্রায় এক বছর সাহবাগে আসিল না। কোন কোন সময় খেয়াল হইলেও তাহাকে ডাকি নাই। কারণ এ শরীর জানিত, সময়ে সব হইবে।

ভোলানাথের উৎকণ্ঠা

ভোলানাথের খাওয়া হইতে হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যাইত। কি করিব। এ শরীর সর্বদা ঢুলু ঢুলু ভাবে পড়িয়া থাকিত কোন জিনিষের জন্য এক কোঠায় গিয়াছি হয়ত অবশের মত সেইখানেই পড়িয়া আছি। স্থান অস্থান নাই। উঠিলে দেখি, কি জন্য আসিয়াছি, সে খেয়ালও আর নাই। সেই সময় কেহ কথা বলিলে শোনা হইত কিন্তু শুনিতে শুনিতে ধোঁয়ার মত আবার তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইত। স্থান অস্থান ছিল না, যেখানে সেখানে নেশাখোরের মত শরীর অবশ হইয়া পড়িয়া যাইত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত। আবার কোন কোন দিন ২/৪ ঘণ্টা পর্যন্ত এইভাবে কাটিত। কখনও আবার অল্প সময়েই উঠিয়া পড়া হইত। ভোলানাথ ভাবিতেন — এইভাবে কি করিয়া সংসারের কাজকর্ম চলে। কেহ আসিলে ভাল হয়। পরে এ শরীরও বলিল — হ্যাঁ, আসিলে ভাল হয়। এ শরীরের ত সকল বিষয়েই নিশ্চিন্ত।

ইহার ভিতর একদিন ভোলানাথের ভগিনী মটরী আসিয়া বলিল যে, তাহার ছেলের দেশের পড়া শেষ হইয়াছে, সে এখন এখানে থাকিতে পারে। ভোলানাথ কোন আত্মীয়ের বিশেষ খবরাখবর রাখিত না। মটরী নিজ হইতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে থাকিয়া গেল। যদিও তাহার শরীর অসুস্থ, তবুও এ শরীরকে কোন কাজ করিতে দিত না। একাই সব করিত। তাহার খাওয়ার বাঁধাবাঁধি ছিল। স্নান নিষেধ ছিল। ঠাণ্ডায় নাকি ব্যারামে পড়িত। কিন্তু এখানে আসা অবধি রোজই স্নান করিয়া ভোগাদি রান্না করা, অবেলায় খাওয়া, অনিয়মে চলা — এ সব সত্ত্বেও তাহার শরীর পূর্বাপেক্ষা বরং ভালই হইতে লাগিল।

এদিকে সংসারের সকল কাজের সুবিধা হইয়া গেল। যাহার কর্ম তিনি করেন, মানুষ ভাবিয়া শুধু বৃথা হয়রান হয়। লক্ষপতির

উপর লক্ষ্য ও নির্ভরতা থাকিলে, তাঁহার মহতী অনন্ত শক্তি আসিয়া সকল ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহার ভাবে অনুভাবিত হইতে পারিলে দেখা যায়, তাঁহাকে যাহা নিবেদন করি না কেন, তাহাই আবার আমাদের কাছে বিশিষ্ট রূপে ফিরিয়া আসে।

এক সত্ত্বা ভাব

কয়েকদিন পর দেখিলাম — যখন লক্ষ্মীর আসনে, যেখানে ২/১টি দেব-দেবীর যে ছবি ছিল যেখানে বসিয়া ভোগ নিবেদন বা প্রণাম করিতে গেলে দেহাত্ম ভাবের প্রকাশটাও যেন কোথায় লয় হইয়া মিলাইয়া যাইত। এক সত্ত্বা ভাবের প্রকাশটিতে শরীরের চলাচল ও কর্ম বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। দিনে দিনে দেখা যাইতে লাগিল, যখনই ঐ আসনের নিকট কিছু নিবেদন করা হইবে বলিয়া বসা হইয়াছে, তখনই উক্ত ভাবটি আসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবশের মত মাটিতে পড়িয়া থাকা হইত। ভোগের অন্ন ব্যঞ্জনাদিতে পিঁপড়া ধরিয়াছে, এ শরীরের সর্বাঙ্গে ও মাথার চুলের গোছায়ও জড়াইয়া রহিয়াছে, যেন তাহাদের নিজের ঘর বাড়ীতে বাস করিতেছে এবং আহারাদিতেও নিশ্চিন্ত আছে। মাথা, হাত, পা, হাঁটু বেকায়দায় পড়িয়া আছে। এইরূপে অনেকদিন অনেক সময় কাটিয়া যাইত। যখন প্রকৃতিস্থ দেখাইত তখনও শরীর ঠিক হইতে বহুক্ষণ লাগিত। নিবেদন করিবার ভাবে বসিতে গেলে, সমস্ত কর্মের গতি যেন কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া কিরূপ হইয়া সুন্দর একটি ভাবে শান্তরূপে পড়িয়া থাকিত।

অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত পালন

ইতিমধ্যে অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত প্রতিষ্ঠার দিন আসিল। ভোলানাথ যখন বাজিতপুরে, প্রথম দিকে, এ শরীর তখন বিদ্যাকুটে ছিল। সে সময়ে এ শরীরের এক ভ্রাতৃবধূ অক্ষয়-তৃতীয়ার ব্রত নিবার মনস্থ করিয়াছিল। ব্রতের পূর্ব দিন সংযমাদিও করিয়াছিল। শেষ রাত্রে উঠিয়া আমাকে বলে যে — ঠাকুরঝি! আমি ব্রত নিতে পারিব না, বাধা হইয়াছে। আপনি আমার আয়োজনাদি নিয়া ব্রত করুন। এ

শরীর বলিল — আমি ত পূর্বের দিন সংযম ব্রত করি নাই, ভোলানাথকেও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কি করা যায়। দেখিলাম শরীরের মায়ের খুব মত, পিতারও আদেশ ছিল। পুরোহিত বলিল প্রাতঃস্নান করিলে সংযম না করিলেও চলে। এইরূপে এই অক্ষয়-তৃতীয়ার ব্রত নেওয়া হইয়াছিল।

ভোলানাথ বলিল টাকাপয়সার অভাব, যাহা না হইলে চলে না, সেই হিসাবে আয়োজন কর। তিনি যাহা করেন তাহাই হইবে, এ শরীরের কোন ভাবনা নাই, কথাও নাই।

ব্রতের পূর্বদিন ভাটপাড়া হইতে পুরোহিত আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত, বলে — ব্রত প্রতিষ্ঠা হইবে শুনিয়া আসিয়াছি। আপনারা ত কিছু জানান নাই। ভোলানাথ বলিল — সংক্ষেপে কাজ তাই কেবল কুল পুরোহিতকে খবর দিয়াছি। পুরোহিত বলিল, আমি যখন আসিয়া পড়িয়াছি, কাজটি পুরোপুরি করিয়া ফেলুন। কত আর খরচ হইবে? তাহাই হইল। অনেকে আসিয়া যোগদান করিল। কাজটি পূর্ণাঙ্গীন ভাবে সুসম্পন্ন হইল।

রমনা কালীবাড়ীতে

ভোলানাথের সঙ্গে প্রায় রমনা কালীবাড়ীতে সন্ধ্যা আরতির সময় যাইতাম। আমি মন্দিরে বসিতাম। কখনো বা পড়িয়া থাকিতাম। উঠিয়া আসিতে ১০/১১টা বাজিত। একদিন শুনিলাম যে প্রত্যহ রাত্রি ১০টার সময় কালীবাড়ীর দরজা বন্ধ হইবে। সেইদিন হইতে রোজ কালীবাড়ী গেলেও কোনও দিন সকালে চলিয়া আসিতাম বা তথায় অন্য কোনও খোলা ঘরে বসা হইত।

পূর্বে একদিন কালীবাড়ীতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া আছি, দেখি ৪/৫ জন সন্ন্যাসী (যাহাদের রমনা কালীবাড়ীতে ও বর্তমান রমনা আশ্রমে সমাধি আছে) তাহাদের সহিত মন্দিরে দেখা হইল। ইঁহারা সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণ করেন। অমাবস্যার রাত্রিতে কালীবাড়ী আসিয়া কয়েক ঘন্টা থাকিয়া চলিয়া যাইতাম। একদিন কালীবাড়ীর ঠাকুর বলিল — আপনারা পূজা হইয়া গেলে যাইবেন। এক অমাবস্যায় দেখি রাজেন্দ্র চ্যাটার্জী ও রাধাচরণের* সঙ্গে দেখা হইল।

* শ্রীরাধাচরণ বিশ্বাস — পুলিশের সাব-ইন্স্পেক্টর।

সাহবাগে মা

একদিন যোগেশবাবুর ছেলে প্রফুল্লবাবু কালীবাড়ী আসিলে, তাহাকে এ শরীরের নামে কে, কি কি বলিয়াছে, এই সব যোগেশবাবু শুনিয়া সাহবাগে অন্য লোকের আসা বন্ধ করিয়া দিল। তখন সাহবাগের চার্জ তাহার উপর ছিল। একদিন যোগেশবাবু নিজে আসিয়া ভোলানাথকে ডাকিয়া অনেক কথা বলিল। ভোলানাথ উহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলিল — তোমার উপলক্ষ্যে এইসব বাহিরের লোকজন আসে, নানা লোকে নানা কথা বলে। আমি এত অপমানিত হইয়া কাজ করিব না। এ শরীর বলিল — তুমি চিন্তা করিও না, এ শরীর নিজে যোগেশবাবুর নিকট যাইয়া যাহা করিতে হয় করিবে। ঘটনাচক্রে পরদিন ১০/১১টার সময় যোগেশবাবু ও ভূদেববাবু আসিল। যোগেশবাবু নিজ হইতেই ভোলানাথকে বলিল — তিনটার সময় গাড়ী পাঠাইয়া দিব, আপনারা আমার বাসায় আসিবেন। আমরা গেলে যোগেশবাবুর শুইবার ঘরে আমাদিগকে লইয়া গেল। এ শরীর চুপ করিয়া বসিল। সাধন ভজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে এ শরীর কুণ্ডলী দিয়া তখনকার অবস্থা কিছু কিছু সংক্ষেপে বলিল। তখন যোগেশবাবু জিজ্ঞাসা করে — আপনি যে মৌন আছেন, কাহার উপাসনা করেন? মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল ব্রহ্মের উপাসনা। অথচ ব্রহ্ম কাহাকে বলে উপাসনা কাহাকে বলে বাহির হইতে কিছুই শোনা নাই।

তাহাকে জানাইলাম যে ভোলানাথ আর বাগানে চাকুরি করিতে চাহে না। আমরা চলিয়া যাই। যোগেশবাবু বলিল — না, না। আপনারা বাগানে থাকুন, যাইতে পারিবেন না। তাহার ছেলে প্রফুল্লবাবু তখন ঢাকার নবাব স্টেট হইতে চাকুরি গিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ কি জিজ্ঞাসা করিল। মুখ দিয়া বাহির হইল — তাহার এখন সময় খারাপ। আট মাস পরে ভাল হইবে। আট মাস পরেই তাহার চাকুরি হইয়াছিল। এই সব নানা কথার পর সাহবাগে ফিরিয়া আসিলাম। আবার নির্বিবাদে দিন কাটিতে লাগিল।

এ শরীর আপনভাবে সাহবাগে বেড়াইত। থাকার একটি ঘর ও একটি বড় নাট মন্দিরের মত ছিল। তাহার দুই কোণায় দুইটি কুঠরী ছিল। আরও একখানি দালান ছিল — খানাঘর বলিত। এইসব স্থানে একলা হাঁটিতে হাঁটিতে মুখ দিয়া আপনা আপনি কত কি বাহির হইত।

একদিন ঐ খানাঘরের বারান্দা হইতে দেখি, বাজিতপুরে যে আরব দেশীয় মহাপুরুষ দেখিয়াছিলাম সে এবং তাহার পিছনে এক চেলা সামনের রাস্তায় কতদূর যাইয়া ঐখানেই মিশিয়া গেল। সাহবাগে যে দুইটি বাঁধান কবর আছে — তাহা ইহাদেরই। ইহার পরে ছেলেরা আলোচনা করিতে শুনিলাম যে আরব নামীয় এক দেশ আছে, তাহাতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী।

প্রাণগোপালবাবু সরকারী কর্ম হইতে অবসর নিয়া ঢাকা হইতে চলিয়া যাইবার কথা হইতেছে। ইতিমধ্যে তাহার পূর্ব পরিচিত অটলবাবু ও গিরিজাবাবু ঢাকায় আসিয়া এই শরীরের সঙ্গে দেখা করিল। প্রাণগোপালবাবু যাইবার পূর্বে এই শরীরের একটি ফোটো লইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। তাহাকে বলিলাম অমুক সময় না হইলে এখন ফটো হইবে না। সে সময় আসিলে ফটো নেওয়া হইল এবং তিনিও ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। উহাই এ শরীরের প্রথম ফটো।

প্রাণগোপালবাবু চলিয়া গেলে তাহার কাজে প্রমথবাবু আসিল। সেও সস্ত্রীক সন্ধ্যার সময় আসিয়া সাহবাগে জপধ্যানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া যাইত।

তখন দিনে তিন গ্রাস খাওয়া হইত। ভোলানাথ একদিন খাওয়ার সময় কাছে দাঁড়াইয়া, তিন গ্রাস খাওয়া হইলে অতি জোরের সহিত বলিতে লাগিল — দেখি তুমি কেমন বেশী খাইতে পার না। শীঘ্র আর এক গ্রাস খাও। এ শরীর লইতে যাইতেছে, আর হাত কাঁপিতেছে ও হাত খুলিয়া ভাত পড়িয়া যাইতেছে। ছেলে মানুষের মত আকুল-ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কি এক রকম হইয়া গেল। ভোলানাথ এইসব দেখিয়া ব্যস্ত সহকারে বলিল — হইয়াছে, আর দরকার নাই। এখন উঠিয়া আস।

অতিথিরূপে

রমনায় যে রাজেন্দ্র চ্যাটার্জীর সহিত দেখা হয় সে সর্বদা রমনা কালীবাড়ী আসিয়া সন্ধ্যার সময় অনেকক্ষণ পর্যন্ত জপাদি করিত।

একদিন প্রাতে সহরে যাইতেছি, ভোলানাথ বলিল — ঐ দিকে রাজেন্দ্র চ্যাটার্জীর বাড়ী। এ শরীর বলিল — তবে ঐ বাড়ীতে চল। ঐখানে গিয়া দেখি কি, সে পূজা করিতেছে, তাহাতে নিত্য অন্ন ভোগাদির সামান্য রকম ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এ শরীর ঘরের বাহিরে আসিয়া কুণ্ডলী দিয়া বসিল। তাহার পূজা শেষ করিয়া আসিলে বলিল — তোমাদের বাড়ী আসার খেয়াল হইল। ছোট্ট ছেলের মত মুখ হইতে বাহির হইল — আমি তোমার ঐ নিবেদিত প্রসাদ নিব। তাহারা ভাবিল ভাল কথা, সধবা ভোজন হইবে। সে বলিল আচ্ছা, কিন্তু একটু পরে। যেখানে যাইবার কথা ছিল সেখান হইতে ঘুরিয়া আবার সে বাড়ী আসিলাম। দেখি বাজার হইতে আরো জিনিষপত্র আনাইয়া রান্না করিতেছে। তাহার স্ত্রী বলিল নিত্য ভোগে সাধারণ ব্যবস্থা। ইহাতে কি আর খাওয়া হয়? তাই আরো কয়েক পদ রান্না করিতেছি। খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে চলিয়া আসিলাম।

বাক্য বন্ধ অবস্থায় অন্যের বাড়ীতে খাওয়া — এই প্রথম। পরে সে একদিন সন্ধ্যায় সাহবাগে আসে। এ শরীরের কথা শুনিতে শুনিতে অনেক রাত্রি হয়, খুব আনন্দের সহিত বলে — আমি রাজেন্দ্র চ্যাটার্জী, যদি এইসব খবর শহরে দিই, তবে বাগান লোকময় হইয়া উঠিবে। এ শরীর বলিল — কি দরকার, যাহার সময় হইবে আপনা হইতে জানিবে। সেইদিন তাহার আর কালীবাড়ী যাওয়া হইল না, বাহিরে প্রণাম করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। পরে একদিন আসিয়া বলিল — রমনা আসিয়া কালীবাড়ীতে না বসা, আমার ঐ দিনই প্রথম হইয়াছিল।

লক্ষ্মীপূজা

ভোলানাথ লক্ষ্মীপূজা করিবে। ব্যবস্থা হইল যে রাজেন্দ্র চ্যাটার্জী পূজা করিবে। রমনা কালীবাড়ীতে দেখা হইলে সে স্বীকার করিল। কিন্তু বাড়ী যাইয়া তাহার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া খবর পাঠাইল যে সে পূজা করিবে না। ভোলানাথ আমাকে বলিল — তুমি পূজা কর। তাহাকে বলিলাম — আমি ত কখনো এইরূপ পূজা করি নাই, দেখিও নাই, কেমন করিয়া লক্ষ্মী পূজা করে। তুমিই কর। ভোলানাথ বলিল — তুমি যাহাই কর তাহাতেই হইবে। তুমি যখন

ইচ্ছা করিয়া কিছু কর না, তোমার ভিতর হইতে যাহা আসে, সেই রূপেই করিবে। লক্ষ্মীর বোধ হয় তাহাই ইচ্ছা। আপন হাতে পূজার জোগাড়াদি করিয়া পূজায় বসিয়া দেখি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর আপনা হইতে কলের মত ঠিক পুরোহিতেরা যেইরূপ পূজা করে, সেই-ভাবে বাহিরের অনুষ্ঠান আরও কত কি সব হইতে লাগিল। কখন কখন শরীর চলিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আবার উঠিয়া পূজার কার্যাদি করে। এইরূপে পূজা শেষ হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল।

ফলাহারের খেয়াল

ইতিমধ্যে আর এক খেয়াল হইল — কেবল ফলাদি খাইয়া থাকিব। বাগানে যে ফলাদি হইত, তাহার মূল্য দিয়া খাওয়া হইত। আর দুধ আপনা হইতে মিলিলে খাওয়া — নতুবা নয়। ফল বা দুধের কোন বাহিরের ব্যবস্থা না করিবার জন্য ভোলানাথকে বলিয়া দিলাম। বাগানে সব সময় ফল থাকিবার কথা নয়, কিন্তু দেখা যাইত এ শরীরের সামান্য খাওয়ার কোন না কোন ব্যবস্থা হইয়াই যাইত।

জানিবে শরীর যাঁহার, রক্ষার ব্যবস্থা তিনিই করেন। এ শরীরের কোন ভাবে বন্ধন প্রকাশ ছিল না। যে সময় ভোলানাথের আদেশ রক্ষার জন্য রান্না সব কিছু মিলাইয়া একটু মাত্র একবার মুখে দিতাম। এই শরীরের অবস্থাদি শুনিয়া বাগানের মালিক প্যারী বাবু বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে বাগানের ফল এ শরীর যাহা খাইত, তাহার জন্য যেন কোন মূল্য নেওয়া না হয়।

দীপান্বিতা পূজা

একবার ভোলানাথের বাড়ী হইতে খবর আসিল, বার্ষিক দীপান্বিতা কালীপূজা ঢাকায় করিতে হইবে। একদিন সন্ধ্যার সময় বাউল আসিলে, বলিলাম — পূজার পুরোহিত ঠিক কর। বাউল বলিল — এ পূজা মায়ের করিতে হইবে। এ শরীর বারম্বার না করিতে লাগিল। তাহা সত্ত্বেও বাউলের কথায় ভোলানাথও জিদ করিতে লাগিল। অটল সে সময় সাহবাগে ছিল, সেও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বলিলাম — কালীপূজা তো, বাহিরের অনুষ্ঠান।

কখনও করি নাই। বিশেষতঃ বার্ষিক পূজা, ইহা পুরোহিত দিয়াই করান দরকার। বাউল বলিল — আচ্ছা! আমরা স্বতন্ত্র একটি প্রতিমা আনিব, মার সেই মূর্তি পূজা করিতেই হইবে। তাহারা ইহাও স্থির করিল যে সে পূজায় বলি দিতে হইবে। বার্ষিক পূজায় বলির নিয়মও নাই।

পূজার দিন বার্ষিক কালীপূজার সকল ব্যবস্থা নিজ হাতে করিয়া দিয়া, অন্য আর এক ঘরে অন্য পূজার আয়োজনাদি করিয়া এই শরীর যাইয়া ভোলানাথের বিশেষ আদেশে পূজায় বসিল। আসন অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর, এ শরীরের হাত নড়িয়া গিয়া যেন কলের পুতুলের মত পূজাদি সম্পাদন করিল। একটি সবল পাঁঠা, বলি দিবার জন্য, স্নান করাইয়া এ শরীরের কাছে আনিল। সেই পাঁঠাটিকে কোলে নিলাম, কোথা হইতে এ শরীরের খুব কান্না আসিয়া গেল। তাহার পর পাঁঠাটির সর্ব শরীরে হাত বুলাইয়া ভিতর হইতে মন্ত্র আসিতে লাগিল এবং উহার শরীরের স্থানে স্থানে মন্ত্র পড়িয়া হাত স্পর্শ করিয়া পরে উহার কানে কানে মন্ত্র জপ হইল। খড়্গ উৎসর্গ করিবার সময় দেখিলাম মাটিতে আসন অবস্থায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছি, খড়্গটি এ শরীরের গলায় অর্থাৎ ঘাড়ে ধরিয়া রাখিলাম। ঘরে অনেক লোক ছিল। ইহা দেখিয়া ভোলানাথ ভীত অবস্থায় এ শরীরের নিকট আসিয়াছিল। অন্য কেহ কেহ ভয় করিয়াছিল খড়্গটি নিজের গলায়ই বসাই নাকি। সে সময় পাঁঠা যেমন ডাকে, ঠিক সেই রকম তিনটি ডাক এ শরীরের গলা দিয়া বাহির হইল। পরে খড়্গ উঠাইয়া, আসন হইতে আসিয়া, ভোলানাথের হাতে বলি দেওয়ার জন্য পাঁঠাটি দিলাম। ভোলানাথ বলি দিতে নিলে পাঁঠাটি একটি ডাকও দিল না বা ছটফট করিল না। কাটার পর রক্তও পড়িল না। অনেক চেষ্টায় উৎসর্গের জন্য সামান্য রক্ত টিপিয়া বাহির করা হইয়াছিল। পূজা শেষ হইতে হইতে ভোর হইয়া গেল।

দিদিমার সহিত অন্নাহার

সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতি ও সোমবার ভাত খাইতাম ও বাকি কয়দিন ফলাদি অতি সামান্য খাইতাম। পাতে একবার যাহা লইতাম তাহাই

খাইতাম। ইহার কিছু দিনের ভিতর শরীরের মা আসিলে, একদিন সোম কি বৃহস্পতিবার মা ও আমি দুই থালায় খাইতে বসিব, মা তাহার থালা হইতে এ পাতে ভাত দিতে লাগিল — এ শরীর চুপ করিয়া রহিল। তখন বাক্‌বন্ধ ছিল। আমাকে চুপ দেখিয়া আরও কিছু ভাত দিয়া, নিজে খাইতে আরম্ভ করিল। এ শরীরও খাইতে আরম্ভ করিল। দেখিলাম মা তাড়াতাড়ি খাইয়া হাঁড়িতে যে ভাত ও তরকারী ছিল, তাহার কিছু এ শরীরের পাতে আনিয়া দিল। এ শরীর সেই সবও এমন কি পাতে লবণ মরিচাদি পর্যন্ত খাইয়া আবার ভাত দিতে ইঙ্গিত করিলে বাকি যাহা ছিল সব দিল আর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। আরো চাহিলে, তখন তাহার ভয় হইল, বলিল — এখন উঠ্। আর খায় না। রাত্রে আবার খাইবি। ভাত ও তরকারী আর নাই। আমিও উঠি না ছেলেমানুষের মত কাঁদ কাঁদ ভাবে কেবলই আরো দিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছি। মা তাড়াতাড়ি ভোলানাথকে ডাকিয়া আনিল। ভোলানাথ বিশেষ বলাতে, তাহার পরে উঠিলাম। ভোলানাথ সেই সব আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিল — খাইতে বসিবার সময় বারবার দেওয়াতে এইরূপ হইয়াছে।

প্রমথবাবুর মৌনব্রত

প্রমথবাবুর স্ত্রী একদিন সন্ধ্যায় বলে — আপনি আদেশ করেন, আমি সোমবার মৌন থাকিব। জানাইলাম — আচ্ছা। পরদিন প্রমথবাবু বলিল — গিন্নি সোমবার মৌন থাকিবার আদেশ নিয়েছে, তিনি যে আগে চলিয়া যাইবেন, তাহা হইবে না। আমি আগে রবিবার করিয়া লই, তাহার পর তিনি সোমবার করিবেন। আমি প্রত্যেক রবিবার মৌন থাকিবার জন্য আপনার অনুমতি চাই। ইঙ্গিতে বলিলাম — বেশ। জিজ্ঞাসা করিল — কি ভাবে মৌন আরম্ভ করিব। তাহাকে একটি ক্রিয়া দেখাইয়া দিলাম। তদনুযায়ী সে রবিবার দিন মৌনব্রত নিল। সোমবার প্রাতে দেখে তাহার আর কথা বাহির হয় না। সে নিজে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বেলা হইয়াছে, অফিসে যাইতে হইবে। সে তাড়াতাড়ি তাহার ছেলে প্রতুলকে ইঙ্গিতে দেখাইল — আমি কথা

বলিতে পারিতেছি না, মাকে খবর দে। প্রতুল তাড়াতাড়ি সাহবাগে আসিল ও তাহার পিতার বিষয় বলিল। ভোলানাথ বলিল — চল তাহার বাসায় যাই। গিয়া দেখি প্রমথবাবু চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভোলানাথ বলিল — কি করিয়া কথা বাহির হয় তাহার ব্যবস্থা কর। পরে তাহাকে কথা খুলিবার ক্রিয়াটি দেখাইলাম এবং তাহা সে করিবা মাত্র কথা খুলিয়া গেল। ইহা পূর্বে জানিয়া না নেওয়াতেই এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। সে তাহার পর হইতে প্রথমতঃ প্রতি রবিবার পরে সপ্তাহে দুই দিন মৌন থাকিত। ইহার মধ্যে লেখাপড়া, ইসারা ইঙ্গিত কিছুই থাকিত না।

অতি ভোজন

এ শরীরের ননদ বেঙ্গী* সাহবাগে আসিল। তাহার একদিন ইচ্ছা হইল মিষ্টান্ন করিবে। প্রায় আধমন দুধ আনাইল; ২৷৷-সের দুধ এক কড়ায় বসাইয়া বাকি দুধের মিষ্টান্ন করিল। বাহিরের মাত্র ২/৪ জনকে খাইতেও বলিল। ভাল ভাল তরকারীও রান্না করিল। ভোলানাথ সহ সকলের খাওয়া হইলে কেবল আমি আর সে বাকি। ইহার মধ্যে ভোলানাথকে বেঙ্গী বারবার বলিতে লাগিল — তিনি ত সব মিলাইয়া তিন গ্রাস খান, আজ আমি মিষ্টান্ন করিয়াছি তুই তাহাকে বল, সর্বদার মত তিতা মিঠা টক সব একত্র মিলাইয়া তিন গ্রাস না খাইয়া, আজ যেন মিষ্টান্ন পরে একটু বেশী খায়। ঘটনাচক্রে সন্ধ্যার সময় আমি ও বেঙ্গী এক সঙ্গে খাইতে বসিলাম। বেঙ্গী বলিল — আজ মিষ্টান্ন বেশী খাইতে হইবে। ভোলানাথ বলিতে লাগিল — সে সারাদিন না খাইয়া বসিয়া আছে, তাহার কথা আজ রাখ। বলিলাম — আচ্ছা। মিষ্টান্ন দিতেছে আর খাইতেছি, খাইতে খাইতে সব মিষ্টান্ন শেষ হইয়াছে এ শরীর বলিতেছে — আরো দাও, আরো খাইব, বলিয়া ছেলেমানুষের মত শরীরটা করিতেছে। ইতিমধ্যে প্রমথবাবু ও রাউল তাড়াতাড়ি প্রমথ বাবুর গাড়ী নিয়া বাজার হইতে দুধ আনিতে গেল। এদিকে কড়াইতে

* বেঙ্গী—ভাল নাম মোক্ষদাসুন্দরী দেবী, স্বামী কালীপ্রসন্ন কুশারী। ইনি ইনস্পেক্টর অফ্ পুলিশ ছিলেন।

যে ২৷৷-সের দুধ ছিল তাহাও মিষ্টান্ন করিয়া আনিয়া দিল, সব খাওয়া হইল। তবুও এ শরীর বসিয়া আছে। পরে বাজার হইতে ৫ সের দুধ আনাইয়া মিষ্টান্ন করা হইল। সেখান হইতে প্রমথবাবুকে সামান্য দিয়া এ শরীর সব খাইল। 'আরো খাইব' — বলিবার ভাবটি আসিল। ইহা দেখিয়া ভোলানাথ বলিল প্রায় আধ মন দুধের মিষ্টান্ন খাওয়া হইয়াছে আর খায় না। আর নাই। তবুও আরও খাইব বার বার বলায় একটু মিষ্টান্ন হাঁড়ি মুছিয়া আনিয়া কি এক মন্ত্রে — বেঙ্গী মাথায় দিল। পরে বলিয়াছিল সীতা দেবী নাকি হনুমানের মাথায় এই ভাবে দিয়া তাহার খাওয়া শেষ করিয়াছিলেন। মাথায় দেওয়া মাত্রই একটা পরিবর্তন আসিয়া ঐখানেই এ শরীর মাটিতে শুইয়া পড়িল। পরে সকলে অনেক পীড়াপীড়ি করাতে শরীরটা উঠিয়া আসিল। ইহারা জিজ্ঞাসা করে — এত কি করিয়া খাইলেন? এ শরীর কিন্তু তিন গ্রাস খাইয়া যেমন থাকে, তোমাদের দৃষ্টিতে বেশী খাইয়াও তেমনই আছে। মাথার উপর যে কাপড়ে মিষ্টান্ন দিয়াছিল, সে কাপড়ে যেখানে মিষ্টান্ন লাগিয়াছিল, সে স্থান পুড়িয়া যাওয়ার মত দেখাইয়াছিল।

সমাধিস্থ সন্ন্যাসীদের ইঙ্গিতে রমনা আশ্রম

শারদীয় পূজার ষষ্ঠীর দিন রমনা, ঢাকেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিয়া রাত্রে সিদ্ধেশ্বরী থাকিয়া পরদিন প্রাতে সাহবাগে আসিলাম। ঢাকেশ্বরী যাওয়ার সময় রাধাচরণ সঙ্গে ছিল। সিদ্ধেশ্বরীতে বাউল ছিল। অষ্টমীর দিন রমনা কালীবাড়ীর নিকটস্থ ছাড়া বাড়ীতে (বর্তমান আশ্রম) ভাঙ্গা মন্দিরের ভিতর যে ভগ্ন শিব রহিয়াছে, তাহার উপর রাজেন চ্যাটার্জীকে দিয়া অষ্টমী পূজার ব্যবস্থা হইল। সেই দিন সেখানে পূজার সময় এ শরীরের মুখ দিয়া সংস্কৃত ভাষায় নানা শ্লোক ও মন্ত্রাদি বাহির হইয়াছিল।

একদিন অমাবস্যার রাত্রে হইয়াছে কি, নিত্যানন্দ গিরি, হরচন্দ্র গিরির সমাধির উপর যে শিব আছে তাহার পূজা করিতে গিয়াছে। কি এক খেয়াল হইল, কালীমন্দির হইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। সে আসনে বসিয়া পূজা করিতেছে, এমন সময় এ শরীরের মুখ দিয়া বাহির হইল — দেখ! আমি তোমাদের এখানে কিছুদিন থাকিব।

বল ত, কোথায় থাকি ? নিত্যানন্দ গিরি (এখন যেখানে আশ্রম) সেইদিক দেখাইয়া বলিল — থাক না গো মা। ঐ বাড়ী ত পড়িয়া আছে। বলিলাম, আচ্ছা। সে আবার বলিল — মনে রাখিও। অনেকে এইসব কথা শুনিয়াছিল। কেহ কেহ বলিল ঠাকুর কারণের মুখে বলিয়াছে — এ সব খাঁটি কথা নয়।

আমি, রাধাচরণ ও ভোলানাথ ঐ ছাড়া বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইতাম। কোন কোন দিন আমরা বাউলের সঙ্গেও যাইতাম। ঐ অষ্টমীর দিন পূজার পর হইতে মাঝে মাঝে কাঁচা দুধ কলা কাহাকেও দিয়া সোমবার তথায় পাঠাইতাম এবং সময়ে সময়ে এ শরীরও সঙ্গে যাইত। সেখানে যে সব সাধু সন্ন্যাসীর সমাধি আছে, তাহাদের ইঙ্গিতে এইসব করা হইয়াছিল। আজ যে ঐখানে আশ্রম সেও তাহাদের ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যেই হইয়াছে জানিবে। যেমন তোমাদের কোন বক্তব্য বিষয়াদির ভিতর যেটি গ্রহণ করি তাহা কাহাকে দিয়াও সম্পন্ন করাই, ঠিক সেইরূপই জানিবে। যাহারা এই আশ্রমের সাধু সন্ন্যাসীদের সংস্রবে ছিল, তাহারাই আবার উপস্থিত উপলক্ষ্যে কর্মাদি করিয়াছে, করিতেছে, করে এবং করিবে জানিবে। বিশেষ প্রশ্নে আরও বলা — ঐখানে এই শরীরটারও যতটা সময় থাকা দেখিতেছ ইহাও ঐ মহাত্মাদেরই ইচ্ছায়। এই ইচ্ছার পূর্ণতা সাধুদের আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা। এই ছোট্ট মেয়েটাকে দিয়া যতটুকু দেখা হইয়া যায়, তোরাও করাইয়া নিচ্ছিস্ ত।

এক সোমবারে একটি নূতন হাঁড়িতে ৫/৭-টি কলা, কাঁচা দুধ আনিয়া তখনকার ভাঙ্গা ও খোলা শিব মন্দিরে এ শরীর, ভোলানাথ ও বাউল গিয়া রাখিয়া আসে। কাঁচা দুধ ও কলা এক হাঁড়িতে ছিল ; হাঁড়িটির মুখে কিছু ছিল না। ৭ দিন পরে বাউল সস্ত্রীক সন্ধ্যার সময় সাহবাগে আসিলে, প্রায় রাত্রি ৯/১০টার সময় সে ভাঙ্গা শিব মন্দিরে যাইয়া দেখে, দুধ কলা হাঁড়িতে যেমন ভাবে রাখিয়া আসিয়াছিলাম ঠিক তেমনই আছে। স্থানটি বড় অপরিষ্কার অথচ হাঁড়িতে একটি পিঁপড়াও উঠে নাই। বলিলাম — এখান হইতে একটু দুধ নিলে হয়। ভোলানাথ বলিল — তাহা ঠিক হইবে না। এখানে সাপ চলাফেরা করে, ঝুরঝুরে ভাঙ্গা মন্দির দেখ না কত গর্ত, যদি দুধে বিষ পড়িয়া থাকে। এ শরীর বলিল — আগে আমি একটু লই। এই বলিয়া একটু দুধ উঠাইয়া মুখে দিল, খাইলাম। সকলে প্রসাদের মত একটু একটু নিল। পরে চলিয়া আসিলাম। পরের দিন সকালে গিয়া দেখে হাঁড়িটি একেবারে পরিষ্কার। কিছুতে যেন ধোয়া মোছা করিয়া সব খাইয়া ফেলিয়াছে।

পরীক্ষা নেওয়ার বিপদ

সাহবাগে তখন একলা চুপচাপ থাকিতাম ও পড়িয়া থাকার ভাব বেশী। ভোলানাথের খাওয়ারও দেরী হইত। ইহা দেখিয়া বাউল তাহার স্ত্রীকে দিয়া পরিষ্কার মত সব মশলার গুঁড়া তৈয়ারী করাইয়া সাহবাগে দিয়া আসিত। একদিন সন্ধ্যায় সেই সব গুঁড়া নিয়া বাউল আসিয়াছে। এ শরীর ও ভোলানাথ তথায় আছে। ইতিমধ্যে ভোলানাথ বলিয়া উঠিল — দেখ, তোমার যে অবস্থা দেখি, আচ্ছা তুমি যদি মরিচের গুঁড়া খাও, তবে না মিশাইয়া, চোখে মুখে জল না ফেলিয়া, অসুস্থ না হইয়া থাকিতে পার ? এ শরীর বলিল — তোমার মনে যখন কথা আসিয়াছে, তখন তুমি নিজ হাতে মরিচের গুঁড়া খাওয়াইয়া দাও না কেন ? ভোলানাথ করিল কি মরিচের গুঁড়া তাহার এক মুঠায় যতটা ধরে, সেইরূপ তিন মুঠা তিনবারে এ শরীরের মুখে পুরিয়া দিল। উহা তিনবারই ছাতুর মত বেশ করিয়া বিনা জলে খাইলাম এবং তাহাদের সম্মুখে প্রায় একঘণ্টা বসিয়া রহিলাম। ইহা দেখিয়া দুজনই অবাক।

মরিচের গুঁড়া খাওয়া প্রসঙ্গে আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন — যেইদিন রাত্রেই মরিচের গুঁড়া খাওয়া হয়, তাহার পরের দিন এ শরীরের পিসীকে ভোলানাথ ঢাকেশ্বরী দর্শন করাইতে নিয়া যায়। দুপুরে ফিরিয়া আসিয়া বলে — কাল রাত্রি হইতে আমার শরীর একটু খারাপ বুঝিতেছিলাম। এখন বোধ হয় জ্বর হইয়াছে। জ্বর ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। দুই তিন দিন পরে রক্ত আমাশয়ও হইল। দিনের পর দিন অসুখ বাড়িতে লাগিল। মিনিটে মিনিটে বমি আরম্ভ হইল। মাথা গরম। ক্রমে ক্রমে অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। প্রমথবাবু একজন ভাল ডাক্তারকে পাঠাইল। ঔষধে কোনও পরিবর্তন নাই। মিনিটে মিনিটে বমির ভাব। বাউল রাত্রে আসিয়া থাকে। এ শরীরেরও খাওয়া দাওয়া চলাফেরা নাই। তাহার কাছে বসিয়া আছে। একদিন রাত্রে বাউলকে বলিলাম —

তুমি কিছু চিড়া আনিয়া দাও। সে চিড়া আনিলে তাহা ভিজাইয়া রাখিলাম। পরদিনও একই অবস্থা। জ্বরও সেই রকমই। দ্বি-প্রহরে জ্বর বাড়িলে মাথায় বরফ দেওয়া হয়। জল ঢালা হইল। ঔষধও খায় না। বিকার অবস্থা। মাথা উঠায়, আর বিছানায় ধপ করিয়া পড়িয়া যায়। একেবারে অস্থির অবস্থা। পরে চক্ষু স্থির করিয়া বিছানায় জ্ঞানশূন্যের মত পড়িয়া গেল। মটরী ও আশু কাঁদিতে লাগিল। এ সময় তাহাদিগকে চুপ করিতে বলিয়া, আমার কি এক ভাব হইল, বাম হাতে ভোলানাথের মাথা উঠাইয়া সারা গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। মুখ দিয়া কি কি শব্দ বাহির হইতে লাগিল। কতক্ষণ পর দেখি ভোলানাথ শ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মেলিল। অতি ধীরে ধীরে বলিয়া উঠিল — আমার বড় কষ্ট, বাঁচাও। তাহাকে বলিলাম — এ শরীরকে আর কখনও পরীক্ষা করিতে যাইও না। বলিল — আচ্ছা। আমি এখন ভাল হইতে চাই। দুই তিন দিন পূর্বে ঔষধ খাওয়া বন্ধ হইয়াছিল। আমি তখন গত রাত্রিতে চারটার সময়ে যে চিড়া ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম, আজ প্রায় রাত চারটার সময় তাহার সরবৎ খাওয়াইলাম এবং জিহ্বায় ও মুখে একটু একটু পুদিনা বাটা দিতে লাগিলাম। দেখিলাম। বমির ভাব ও অস্থিরতা কমিয়া গেল। রাত্রি ভোর হইল। ভোলানাথ অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাইলেন। জ্বর বাড়িয়া পরে একটু একটু কমিতে কমিতে দুই-একদিনের ভিতরই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

দেওঘরে প্রাণগোপাল বাবুর কাছে বাউল ভোলানাথের অসুখের কথা লিখিলে, তিনি ভোলানাথের নিকট এক পত্র দিলেন যে — মা গুরু-মারা বিদ্যা কোথায় শিখিলেন, মাকে জানাইতে বলিবেন। এ শরীর জবাব দিল — গুরুর কাছেই গুরু-মারা বিদ্যা শেখা হইয়াছে। দেখা যাইত, তখন এ শরীরকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যদি কেহ কোনরূপ ফন্দী আঁটিত, তবে সে বুঝুক না বুঝুক, উহার একটি বিপরীত ক্রিয়া তাহার উপর দিয়া হইয়া যাইত। যেমন আগুন ঘাঁটিলে তাপ লাগে, বরফের কাছে গেলে ঠাণ্ডা লাগে। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

বিভূতি

এই ঘটনার পাঁচ ছয় দিন পূর্ব হইতে কি রকম একভাব হইয়াছিল। তিনদিন পর্যন্ত দিনরাত্রি সমানে এক চোখ একবারে বন্ধ আর এক্ হাত উর্ধ্বে উঠান। আবার তিন দিন পর বন্ধ চোখটা খুলিয়া গেল। খোলা চোখটা বন্ধ হইয়া গেল। উর্ধ্ববাহু নামিয়া গেল। এইরূপে ছয়দিন ছিল। সাতদিনের দিন আবার দুই চোখের স্বাভাবিক অবস্থা হইল।

এই ভাবে সাধক কিন্তু উর্ধ্ববাহু হইয়া সর্বদার জন্য স্থিত থাকিতে পারে। ইহাও এক রকমের অবস্থা। উর্ধ্ববাহু হওয়ায় দেখা গেল, অনায়াসে উর্ধ্ববাহু সর্বদার জন্য রাখা যায় এবং সহজ ভাবে থাকে, কোন অসুবিধা বা কষ্টের চিহ্নমাত্র থাকে না। আর উর্ধ্ববাহু হইতে যে স্থিতি — সেই স্থিতি।

পরে আবার খেয়ালে আসিল — এই জাতীয় সিদ্ধাবস্থা হইলেই বা কি হইল? সর্বদার জন্য চক্ষু বুঝিয়া গেল সেই ধ্যানে, তাহাতেই বা কি হইল? সর্বদার জন্য চক্ষু খুলিয়া গেল, বাক্সিদ্ধ হইল — তাহাতেই বা কি হইল? একটা অঙ্গ উর্ধ্বে তৎলক্ষ্যে না হয় এইরূপ হইল — তাহাতেই বা কি হইল? যোগীদের ত ইহা স্বাভাবিক, আসিবেই। চরম পরম চাই ত।

বিভূতি ধর — যা কিছু খেয়ালমাত্র যে ভাবেই হউক সেই সেই স্থানে প্রকাশিত হইল। যাহা খেয়াল হওয়া, তাহাই প্রকাশ হওয়া — তাহাতেই বা কি হইল? যেখানে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সেখানে জগতে যাহা হইতেছে সব কিছু যে তাঁহাতে — যাহা প্রকাশ আছে নিত্য — ইহা কি বিভূতি? বিভূতি কাহার মধ্যে প্রকাশ? তাঁহাতে, তাঁহার খেলা যেখানে — এতো স্বভাব, নিত্য, তিনি স্বয়ং। বিভূতি বলিলে — তিনি নিত্য বিভূতি। তিনি বিভূতি সেই নিত্য — আছে রূপে, নাই রূপে সে-ই। এ যে তাঁহারই স্বভাব। স্বভাব মানে নিজে নিজেই। স্বয়ংই ভাবরূপে। যেখানে অভাবের স্থান নাই। এখানে বিভূতির স্থান কোথায়?

সাধকের বিভূতি প্রকাশ বলিতে ত — অভাব যেখানে নাই কিন্তু আছে বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে। নাই-রূপে যে — তাহা কিন্তু এখানে নয়। যেখানে অভাব যাহার দৃষ্টিতে, তাহারা

দেখিতেছে বিভূতি। বিভূতি যদি বল, যাহা প্রকাশ সবই বিভূতি।

সাধকের যখন ক্রমোন্নতিতে বিভূতি লাভ হয়, একটা হয় — যে লাইনের শক্তি যাহার ভিতরে প্রকাশ, সে লাইনে সেই দিক দিয়া এক সিদ্ধ। সেই লাইনে-ই মাত্র তাহার অধিকার, ততটুকুই পাইবে সে। কিন্তু সব সময় তাহা প্রকাশ থাকিবে কিনা — কোন স্তরেতে তাহারও প্রকাশ থাকে না। ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব রহিয়াছে বলিয়া, অপ্রাপ্তি থাকে বলিয়া, সেই স্থান হইতে পতনও হইতে পারে। আবার কিছু প্রকাশ হইয়া আগেও চলিতে পারে। এক দিকের একটু শক্তি প্রকাশ মাত্র — অভাবের মধ্যে। সেই স্থিতিতে ভুলিলে, সাধকের পতন আসবেই।

নিজের রাজত্ব বুঝিয়া লইবার দিক কিনা — ঐ যে মহারাজ বলে, সাক্ষী বলে। মহারাজ মানে যাহার উপর রাজার প্রশ্ন নাই — স্বয়ং-ই। সে যে পর্যন্ত না সেই স্থিতিতে, সেই পর্যন্ত নিজের জমিদারীতেই হউক, রাজত্বেই হউক, প্রবেশ করিতে গেলে এই যে বিভূতি এইসব ত আসিবেই। যেখানে স্বয়ং, যেখানে সে মহারাজ — সে লাইন দিয়া যাইয়াই সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ নিজেকে পাওয়া। পাওয়া কি? যাহা আছে তাহারই প্রকাশ। তাহাতে আর বিভূতি কোথায়? তিনি স্বয়ং-ই ত।

বিভূতি যদি বল, এক তিনিই। আর সাধকের বিভূতির প্রকাশ। সাধকের দিক দিয়া কিন্তু বিভূতি ঐশ্বর্য বলা চলে। কিন্তু সৃষ্টি স্থিতি লয় এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু — মূর্ত অমূর্ত, সাকার নিরাকার, উপাসক, নানা রকম সাধক, যোগী, মহাযোগী, অবতার, দেবতা, অবতরণ, সেখানে অবতরণের প্রশ্নও নাই — ঐ-ইত, যা তা। সেখানে ব্যক্তি কোথায়? স্বয়ংইত। সাধকের বিভূতি ব্যক্তিতে, সংখ্যাতে ত। সেখানেও কিন্তু সে-ই — এই রূপে।

জ্যোতিষের সহিত ভগবৎ সূত্রে যোগাযোগ

জ্যোতিষ একবার 'সাধনা' নামে একখানি বই লিখিল। ঐ পুস্তক এই শরীরকে শুনাইবার জন্য ভূপেনকে একদিন পাঠাইয়া দিল এবং এ শরীর কি বলে তাহা জানিতে চাহিল। তাহাকে বলিলাম — যাহার বই তাহাকে পাঠাইয়া দিও। সে প্রায় একবৎসর পূর্বে সাহবাগে আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে আর আসে নাই। ভূপেন যাইয়া ঐ কথা বলিলে সে একদিন আসিল। নিজে পুস্তকখানি পড়িয়া এ শরীরকে শুনাইল। এ শরীরের কথা বন্ধের তখন তিন বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। এ শরীর তখন কুণ্ডলী ছাড়া কথা বলিলেও কেমন একটা চাপা চাপা ভাব থাকিত। বেশী কথা বা সব সময় কথা একেবারেই হইত না। সেইদিন জ্যোতিষ আসিলে আমি ও ভোলানাথ বসিয়া তাহার সহিত এই প্রথম কুণ্ডলী ছাড়া বেশ খোলা ভাবে তত্ত্ব বিষয়ক কথা বলিলাম। সেই হইতে প্রায় প্রত্যহ জ্যোতিষ সাহবাগে আসিত।

একদিন এ শরীর, ভোলানাথ, ভূপেন ও জ্যোতিষ বসিয়া কথা-বার্তা বলিতেছে, হঠাৎ আমার চোখে তাহার সহিত প্রথম দিনে সাক্ষাতের ছবি আসিল। তখন হইতে দেখা যাইতে লাগিল সে যেন একখানি চাদর গায়ে দিয়া পবিত্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত এ শরীরের সম্মুখে বসিয়া আছে। যদিও তাহার নাম মুখে আসিল না, এ শরীর বলিয়া উঠিল — আমরা এখানে তিনজন ব্রাহ্মণ আছি। চার পাঁচ মাস পরে শশাঙ্কবাবুর ছেলে নন্দু এই শরীরকে কথায় কথায় বলে যে জ্যোতিষবাবুর পায়ে পড়িয়া আমার নমস্কার করতে ইচ্ছা করে। এ শরীর বলিল — তোমার যখন ইচ্ছা জাগিয়াছে, সুযোগ হইয়া যাইবে। ইহার পর সে একদিন সাহবাগে আসিলে জ্যোতিষকে সেইভাবে নমস্কার করিল। এ শরীর জ্যোতিষকে বলিল — সেই দিন যে তিনজন ব্রাহ্মণের কথা এ শরীরের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, তোমার উপরই লক্ষ্য ছিল। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত এ শরীরের ভগবৎ সূত্রে যোগাযোগ।

অমাবস্যার ভোগের সূত্রপাত

প্রমথবাবু চাকরি উপলক্ষ্যে কলিকাতা গিয়া আবার ঢাকা ফিরিয়া আসে। কলিকাতা যাইবার সময় বলিয়া যায় যে, সাহবাগে যেন নিত্য ভোগ পাঠাইবার ত্রুটি না হয়। ভোগের একদিন গোলমাল হওয়ায় প্রতুল (প্রমথবাবুর ছেলে) আমাদের কাছে আসিয়া বলিল — আমার এক প্রার্থনা আপনাদের শুনিতেই হইবে। কাল আমি

ভোগের ব্যবস্থা করিব। মা যে কেবল সোমবার ও বৃহস্পতিবার খান, তাহা আমি শুনিব না। কাল মাকে খাইতেই হইবে। দেখিলাম সে ভোলানাথকে মানাইয়া লইল। এ শরীর ভোলানাথকে বলিল — তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করা হইবে। পরদিন প্রতুল সব ব্যবস্থা করিল। নিজে বাজারে যাইয়া মনের মতো নানা জিনিষ নিয়া আসিল। তাহাকে ও আরো দুই তিন জন যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকেও খাইতে বলিয়া দেওয়া হইল। সকল বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইতে হইতে বেলা চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে খেয়াল হইল আজ ত অমাবস্যা। আমরা ত প্রত্যেক অমাবস্যায় রমনার কালীবাড়ী যাই। সেখানে পূজা ভোগাদি শেষ হইলে ভোলানাথ প্রসাদ পাইয়া থাকে। আজ কি হইবে? ইহা ভাবিতে ভাবিতে স্থির হইল যে প্রতুলের এই ভোগের দিনে যখন অমাবস্যা পড়িল, তখন এখানেই অমাবস্যার ভোগ আজ নিবেদিত হইবে। পরে এখানে প্রতি অমাবস্যায় ভোগ দেওয়া যাইবে, তবে নিরামিষ।

অখণ্ডানন্দ, পূর্বাশ্রমের নাম শশাঙ্কবাবু, ইনি এই ভোগ নিয়মিত রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সে অমাবস্যার ভোগ আশ্রমে এখনও চলিতেছে। সেইদিন সব রান্না শেষ হইতে রাত্রি হইল। ভোগাদি নিবেদন হইল। প্রসাদ বিতরণের সময় প্রতুল বলিল — আজ যত রাত্রিই হউক না কেন, মায়ের খাওয়া না হইলে বাসায় যাইব না। ভোলানাথও জোর করিল। এ শরীর খাইতে বসিল। ভোলানাথকে বলা হইল — খাবার থালা হইতে তুলিয়া তুমি আমার হাতে দাও। দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া বসিলাম। ভাত দিতেই দুই হাত ফাঁক হইয়া মাটিতে সব পড়িতে লাগিল। হাতে জোর করিয়াও রাখিতে পারি না। সব জিনিষ এইভাবে দেওয়া শেষ হইলে, মাটি হইতেই তুলিয়া তুলিয়া খাইলাম। পরে হইল কি — খাওয়ার সময় সব জিনিষ থালা হইতে মাটিতে ঢালিয়া খাইতাম। খাইতে বসিলে অনেক সময় দেখিতাম — সেইস্থানে চুল বা অন্য রকম ময়লা পড়িয়া আছে। কিন্তু পরিষ্কার করিয়া খাইবার জন্য কোন খেয়াল আসিত না। খেয়াল হইত খাইব বলিয়া যখন বসিয়া গিয়াছি তখন খাবার জিনিষ যেভাবে পাওয়া যায়, সে ভাবেই গ্রহণ করা আবশ্যক। এ রকমে মাটিতে খাওয়া প্রায় একমাস চলিতেছে। একদিন ভোলানাথ আসিয়া বলে — তুমি কাঁসার থালা বা পিতলের

থালা কিংবা পাথরে বা পাতায়ও খাইবে না তবে কি তুমি রূপার থালায় খাইবে? তাহার এই কথাগুলিতে একটু রুক্ষতা ও রাগ জড়ানো ছিল। হঠাৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিলাম — আচ্ছা বেশ, আমি রূপার-থালায় খাইব। কিন্তু তুমি নিজে তৈয়ার করিয়া আনিলে বা অন্য কারো দ্বারা তুমি সংগ্রহ করিলে সে থালায় খাইব না। সাবধান! এ কথা তিনমাসের মধ্যে কাহাকেও বলিও না। ভোলানাথ তাহা স্বীকার করিল। এই তিন মাসের মধ্যে একদিন জ্যোতিষের স্ত্রী ফল পুষ্পাদি সহ পাথরের বাটিতে এক বাটি রাবড়ীর দই ও একখানা রূপার থালায় একথালা সন্দেশ নিয়া আসিল। বলিল — এ রূপার বাসনে আপনি ভোগ দিবেন ও খাইবেন। সেদিন হইতেই রূপার বাসনে কিছু সময় খাইয়া পরে সব বাসনে খাইতে লাগিলাম।